রবীন্দ্র সান্নিধ্যে চিত্রনিভা চৌধুরী

রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে প্রকাশিত চারুকলা স্মৃতিকথা সিরিজের বই চিত্রনিভা চৌধুরীর স্মৃতিকথা পড়ার পর সন্ধিনী রায়চৌধুরী-র কলমে উঠে এল অসাধারণ এক ব্যক্তিত্বের অসাধারণ এক ছবি।

চিত্রনিভা চৌধুরীর জন্ম মুর্শিদাবাদে ২৭ শে নভেম্বর ১৯১৩ সালে এবং পারিবারিক নাম নিভাননী। ১৯২৭ সালে নোয়াখালির লামচর গ্রামের জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরীর মেজোছেলে নিরঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং শ্বশুরবাড়ির উৎসাহে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হয়ে নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকা ও সঙ্গীত ভবনে গিয়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এস্রাজ, সেতার এবং বীণা বাজাতেও শেখেন। সামগ্রিক লেখাপড়ার দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবির সাহচর্যে চিত্রনিভা অজস্র ছবি এঁকেছিলেন। একদিন নিভাননীর আঁকা অনেকগুলি ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে কবি তাঁর নূতন নামকরণ করেন চিত্রনিভা। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথ নিভাননীকে চিত্রনিভা বলে ডাকতেন এবং প্রায়ই রসিকতা করে বলতেন 'তোমার নামকরণ করলুম, এখন বেশ বেশ ঘটা করে আমাদের খাইয়ে দাও।' চিত্রনিভার লেখা 'স্মৃতিকথা'-য় আমরা তাঁর অকপট-কথনের ভিতর দিয়ে এমনিভাবে তাঁর একান্ত কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে অজ্ঞাত ও অল্পজ্ঞাত অনেক তথ্যই উঠে আসতে দেখি যার ভিতরদিয়ে সমগ্র মানুষটির ব্যক্তিত্ব, রসবোধ, সচেতনতার সঙ্গে পিতৃস্নেহের ফল্গুধারা বয়ে যেতে দেখা যায়।

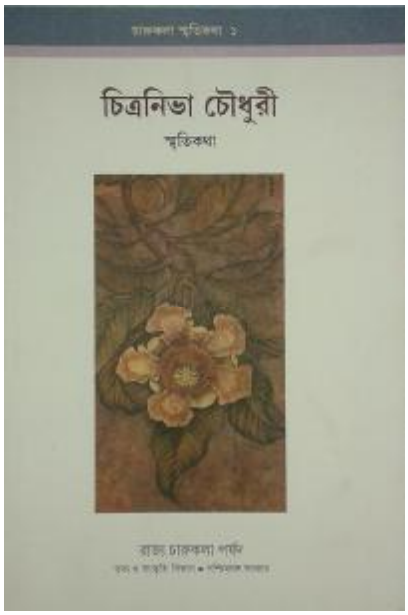

চিত্রনিভা চৌধুরীর স্মৃতিকথা গ্রন্থের প্রথম পর্বের সূচনা হয়েছে 'আমার ধ্যানের ঋষি রবীন্দ্রনাথ, আমার ধ্যানের আশ্রম শান্তিনিকেতন' – এই শিরোনাম দিয়ে। রবীন্দ্রনাথই যে তাঁর লেখার প্রেরণা তার ইঙ্গিত যেমন এখানে পাওয়া যাচ্ছে তেমনি শীর্ণকায় বইটি জুড়েই যে শান্তিনিকেতনের তপোবন সুলভ প্রেক্ষিতটা পাওয়া যাবে তা-ও আভাসিত হয়েছে।

সদ্য পরিণীতা নিভাননী একদিন সন্ধ্যায় শরৎকালীন পূজাবকাশের মধ্যে শান্তিনিকেতনের অপরিচিত মানুষজন, অচেনা পথঘাটে সমন্বিত আশ্রমে এসে পৌঁছালেন। আশ্রমের স্কুল বোর্ডিং সবই তখন বন্ধ থাকায় তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল উত্তরায়ণে 'কোনার্কে' কবির বাড়িতে ছোট্ট একটি ঘরে। কবির বাড়িতে তখন পরিচারক, পরিচারিকা

ছাড়া কেউই না থাকায় কিশোরী মেয়েটিকে বিনা কাজে নিঃসঙ্গভাবে কাটাতে দেখে কবির পিতৃহৃদয় ব্যথিত হত বলে প্রতিদিন প্রভাতবেলায় মেয়েটিকে সিঁড়িতে একাকী বসে থাকতে দেখে স্নেহভরে আশীর্বাদ করে যেতেন। তারপর একদিন তাঁর এক পরিচারিকার সঙ্গে চিঠি লিখে নিভাননীকে পাঠিয়ে দিলেন নন্দলাল বসু এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিক্ষার জন্য। কাজেই ছুটিতেই নিভাননীর শিক্ষা শুরু হয়ে গেল। এইভাবে শান্তিনিকেতনের শুরুর দিনগুলি থেকেই প্রতি প্রভাতে ঋষি রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও স্নেহস্পর্শে সিক্ত হয়ে কবিগুরুর আশীর্বাদ ধন্য নিভাননী রূপান্তরিত হলেন পরিবর্তিত পরিচিতি চিত্রনিভাতে।

পূজার ছুটি শেষে চিত্রনিভা যখন হস্টেলে গেলেন তখন আর তাঁর কোন সঙ্গীসাথীর অভাব রইলো না। গুরুদেবের কাছে ছাত্রছাত্রীদের ছিল অবারিত দ্বার। তিনি সবসময়ই বলতেন, 'তোমাদের যখন যা বুঝতে ইচ্ছা হয় আমার কাছে এসে বুঝে নিও।' এই সুবাদে চিত্রনিভা ও তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ফিরোজা বারি দুজনে মিলে প্রতিদিন দুপুরের নিস্তব্ধতায় চয়নিকা বইখানি হাতে নিয়ে গুরুদেবের বিশ্রামের সময় তাঁর দরজার আড়ালে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াতেন। বিরল-তাপস ধ্যানমগ্ন ঋষি রূপে তখন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছেন। কবির ধ্যানভঙ্গ হলে মৃদু হেসে চয়নিকা বইখানি হাতে নিয়ে একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি করে যেতেন। কিছুদিন পরপরই তিনি ঘর বদলাতেন তাই তাঁকে খুঁজে পেতে মাঝে মাঝেই কন্যাদুটিকে বেশ বেগ পেতে হতো। সৃষ্টির খেয়ালে এক জায়গায় একই ঘরে কাজ করতে চাইতেন না বলেই বৈচিত্র্যের সন্ধানে ছোট্ট একটি ঘর খুঁজে নিয়ে সেখানেই কাজে লিপ্ত হতেন। কতদিন দেখা গেছে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও কাজ করে চলেছেন। তাঁর লেখনী কখনও বন্ধ হতো না।

শেষ বয়সে অবশ্য বেশীরভাগ সময়ই কবি ছবি আঁকায় মগ্ন থাকতেন বলে কলম অথবা তুলি হাতে ছবি এঁকেই চলতেন। কাগজের কোন বাছ-বিচার ছিল না। হাতের কাছে যা পেতেন তাতেই ছবি আঁকার নেশায় কিছু না কিছু এঁকে ফেলতেন। ছবি আঁকার ফাঁকে কবি যে রসিকতা করতেও ছাড়তেন না তার একটি নমুনা দিতে গিয়ে লেখিকা উল্লেখ করেছেন যে একদিন রং তুলিতে দুটি পাখির ছবি যখন আঁকছিলেন কবি তখন দুই বন্ধুকে একাগ্রভাবে তা লক্ষ্য করতে দেখে কবি সহাস্যে রসিকতা করে বলে উঠলেন 'এই পাখি দুটি যেন ঠিক তোমরাই দুই বন্ধু'। মাঝে মাঝে গুরুদেবের রঙের বাটি, তুলি ইত্যাদি ছবি আঁকার সরঞ্জাম পরিস্কার করে দেবার সময় চিত্রনিভা কবির কাছ থেকে উপহার-স্বরূপ যে কয়েকটি রঙের বাটি পেয়েছিলেন তা কবির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ চিত্রনিভার কাছে সযত্নে রাখা ছিল।

চিত্রনিভা যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন তখন মেয়েদের ছাত্রীনিবাস ছিল দ্বারিকে। শিশুরাও তখন তাদের সঙ্গে একত্রে থাকা এবং খাওয়া দাওয়া করতো। কবির নির্দেশ মত সকলেই নিজেদের থালা-বাসন নিজেরাই ধুয়ে নিতো। বড়ো মেয়েরা পালা করে ছোট শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতেন। অতঃপর গুরুদেব যখন 'শ্রীসদন' নামে মেয়েদের জন্য ছাত্রীনিবাস নির্মান করলেন তখন কবিগুরুর নির্দেশে ঘরগুলিতে বিরাট বিরাট জানলায় কোন শিক লাগানো হয়নি। কবির অভিপ্রায় ছিল মেয়েরা সাহসী হোক্ এবং আত্মরক্ষার শিক্ষায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। কিন্তু যিনি ছাত্রীনিবাসের গৃহধ্যক্ষা ছিলেন তিনি গরাদহীন বিরাট বিরাট গবাক্ষযুক্ত ঘরে এতগুলি মেয়ের দায়িত্ব নিতে সাহস পেলেন না। একথা শুনে রুষ্ট হয়ে কবিগুরু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মেয়েদের যদি এতটুকু সাহস না থাকে তাহলে এ বাড়ি আমি ছেলেদের দিয়ে দেবো।' আরও বললেন, মেয়েদের জন্য যখন তিনি বাঘের খাঁচা তৈরী করে দেবেন তখনই তারা নতুন বাড়িতে যেতে পারবে। মেয়েরা তখন সমস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে যখন বলল যে তারা চোরের ভয় পাবে না আর এ বাড়ি তাদেরই দিতে হবে তখন খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদেরই ছাত্রীনিবাসে গৃহপ্রবেশের অনুমতি দিলেন। শ্রীসদনে মেয়েদের জন্য ছোরাখেলা, লাঠি খেলা, জুজুৎসু ইত্যাদি সবরকমের খেলার ব্যবস্থা ছিল কারণ তিনি চাইতেন মেয়েরা যেন সাহসী ও নির্ভীক হতে পারে। তিনি সবসময় বলতেন, 'এই আশ্রম আমি বিশেষ করে মেয়েদের জন্যই তৈরি করেছি, যাতে মেয়েরা মুক্তভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে।' সেকালের রক্ষণশীল পারিপার্শ্বিকতায় রবীন্দ্রনাথ যে মেয়েদের কতখানি উপরে স্থান দিয়েছিলেন তা শান্তিনিকেতনে বিশেষভাবে নির্মিত এই আশ্রমই প্রমাণ করছে। এদিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের মানসিক মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ যা করে গিয়েছেন তার জন্যই বিশেষকরে মেয়েরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সে সময় অন্যত্র মেয়েদের জন্য যে সব বিধি-নিষেধ বা কড়াকড়ি নিয়ম-নির্দেশিকা পালিত হত শান্তিনিকেতনে মেয়েরা তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটাই স্বাধীন ছিল। একবার আশ্রমের মাতৃরূপা গৃহাধ্যক্ষা যখন নিয়ম করে দিলেন যে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দুপুর বেলায় কোন মেয়ে শ্রীসদনের বাইরে যেতে পারবে না আর বিকেলে বেড়াবার সীমানা নির্দিষ্ট হল পশ্চিমদিকের সাঁওতাল গ্রাম পর্যন্ত আর উত্তর দিকের পরিধি হল গুরুদেবের বাড়ির শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি তালগাছ পর্যন্ত তখন সবচাইতে বেশি অসুবিধায় পড়লেন চিত্রনিভা, কারন নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় গুরুদেবের কাছে কবিতা বুঝে নেওয়া আর

কলাভবনের নিরিবিলিতে ছবি আঁকার জন্য এ সময়টাই ছিল তাঁর কাছে প্রশস্ত। এছাড়াও একটা স্কেচবুক সঙ্গে করে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকাই ছিল তাঁর বিকেল বেলার রুটিন। তাই নিয়মের গণ্ডিতে বাঁধা পড়লে এ দুটি কাজের কোনটিই হওয়ার নয় বলে চিত্রনিভা গুরুদেবের শরণাপন্ন হলেন। চিত্রনিভার সব কথা শুনে গুরুদেব তাঁকে অভয় দিলেন, 'তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম ঐ তালগাছ ছাড়িয়ে যতদূর ইচ্ছে তুমি স্কেচ করতে যেতে পারো।' এইভাবে কবিগুরু মেয়েদের কোন বাঁধনেই আটকে রাখেননি বলেই চিত্রনিভা শান্তিনিকেতনের নীল আকাশ, সবুজ মাঠ আর খোলা হাওয়ায় মুক্ত বিহঙ্গের মত নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। বোধকরি এ কারণেই তাঁর ছবির ভাণ্ডার শান্তিনিকেতনের লতা, পাতা, ফুল,পাখি আর বৃক্ষরাজিতে ভরে রয়েছে। 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থের প্রচ্ছদে যেমন তাঁর নিজের আঁকা চালতা ফুল আছে তেমনি গ্রন্থে বিধৃত চিত্রাবলিতে আছে কদমফুল, পলাশ, কুমড়োফুল, শিমুল ইত্যাদির পাশাপাশি সারিবদ্ধ গাছের শাখায় আঁকা 'কাক ও ছানারা'। আছে শান্তিনিকেতনের 'সন্ধ্যার আকাশ', 'জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠ'। তাঁর চিত্রাবলী যেমন প্রাকৃতিক কারুকলায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে তেমনি আছে গ্রামীণ পরিবেশে আশ্চর্য জীবন্ত 'সাঁওতাল পরিবার', 'বাংলাদেশের দূর্গাপূজা', 'শান্তিনিকেতনে কালো মাটির বাড়ীর ভাস্কর্য', 'পোর্ট্রেট অফ রামকিঙ্কর' ইত্যাদি। শিল্পী নিজের ছবিতে যখন নিজেই নামকরণ করেন তখন ছবিটির গুরুত্ব বাড়ে কিন্তু ছবির নামকরণে প্রবল অনীহা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কলকাতায় আর্ট কলেজে যখন রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী হয় আয়োজক অধ্যক্ষ বলা যায় একরকম জোর করেই ছবিগুলির স্বতন্ত্র শিরোনাম দিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে চিত্রনিভা গুরুদেবের বিপরীতধর্মী চিত্র-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন কারণ গ্রন্থে প্রদর্শিত তাঁর সবকটি ছবিতেই তিনি যথোপযুক্ত নামকরণ করায় ছবিগুলির মর্মকথা আভাসিত হচ্ছে। তাঁর ছবিগুলিতে প্রকৃতির অমলিন প্রকাশ যেমন আছে তেমনি সহজ অথচ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর মননের প্রতিফলন। গাছের সবুজ রোদ্দুরের উন্মত্ত হলুদ ও সেই সঙ্গে আকাশি-নীলের সম্মিলিত প্রয়োগে প্রাণ পেয়েছে আমাদের অতিপরিচিত নিসর্গ দৃশ্যের এক অন্যতর রূপ। বর্ষণসিক্ত কদমফুল কিম্বা বসন্ত সমীরণে আন্দোলিত পলাশের পাশাপাশি জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণীর পত্রজাল ভেদ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে পথের নিষ্প্রাণ শরীর। শিল্পী এইরকম বৃক্ষরূপ আরো ফুটিয়েছেন বিভিন্ন

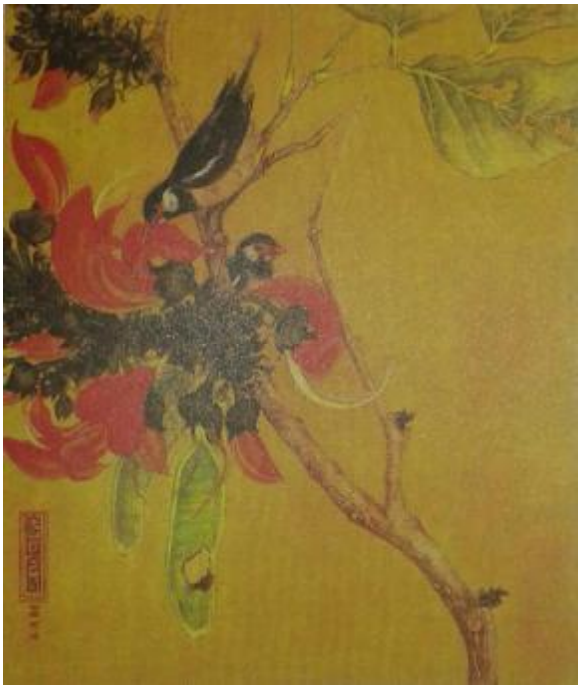

দৃষ্টিকোণে। এঁকেছেন 'দোল উৎসবে রবীন্দ্রনাথ', 'বাল্মিকীর প্রতিভা', 'একলব্য' কিম্বা 'ননীচোর' এর মত ছবিও। এগ্রন্থে অবশ্য তাঁর ছবির বিষয় মূলত প্রকৃতি পাঠ। ধরিত্রীর আপাত নিথর আবরণে শিল্পী তাঁর রং তুলিতে গ্রাম-বাংলার যে মেঠো রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তা মুগ্ধতা জাগায়। আর এই সহজ অথচ সুন্দর নিসর্গ প্রকৃতির খোঁজ পেতে শিল্পীকে যে শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামেগঞ্জে ঘুরতে হয়েছে তার সাক্ষ্য আছে গ্রন্থটির পাতায় পাতায়।

সে সময় দেশ বিদেশ থেকে কোন নতুন মেয়ে শ্রীসদনে এলেই চিত্রনিভা তাদের সঙ্গে গুরুদেবের পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে যেতেন, তাই গুরুদেব সবাইকে বলতেন, 'চিত্রনিভা হচ্ছে নূতনের সঙ্গী'। গুরুদেবের নির্দেশ ছিল বিদেশীরা আমাদের অতিথি বলে তাদের যেন কোন অযত্ন না হয়। গুরুদেব সবসময়ই চাইতেন যে কোন দেশের ভালো জিনিসটি যেন আশ্রমের ছেলে-মেয়েরা গ্রহণ করতে শেখে। একবার গুরুদেবের বিদেশের সফর শেষে আশ্রমে ফিরে এসে নিয়ম করে দিলেন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই যার সঙ্গে দেখা হবে তাকে নমস্কার করে অভিবাদন জানাবে। তারপর থেকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নমস্কারের ধুম পড়ে গেল। একটি নমস্কারেই যে অপরকে কত আপন করে পাওয়া যায় চিত্রনিভা তার প্রমাণ পেয়েছিলেন ১৯৪৯ সালে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে। তখন পৃথিবীর নানা দেশ থেকে শান্তিবাদী যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য কোন ভাষাই জানতেন না বা বুঝতেন না, কিন্তু তাঁদের আপন করে পেতে ভাষা কোন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁরা দেশীয় প্রথায় কত আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাভরে করজোড়ে সকলকে নমস্কার জানিয়েছিলেন তার কথা লিখতে গিয়ে গুরুদেবকে স্মরণ করে চিত্রনিভা লিখেছেন :

'কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।'

বিশ্বশান্তি সম্মেলনে আগত অতিথিদের প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যেমন চিত্রনিভার নিবিড় সংযোগ হয়েছিল তেমনি গুরুদেবের জীবিতকালে উত্তরায়ণে তাঁর বাড়িতে দেশ বিদেশ থেকে শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্যিকরা আসতেন যখন তখন নাচে গানে নাটকে তাঁর বাড়ি সবসময়ই সরগরম থাকতো। বিশিষ্ট অতিথিরা এলে অনেক সময়ই সেখানে সকলকে যেতে দেওয়া হত না, কিন্তু গুরুদেবের স্নেহসান্নিধ্য ও সংস্পর্শে এসে চিত্রনিভা বহু মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই সুবাদে পৃথিবীর খ্যাতিমান মানুষদের অজস্র প্রতিকৃতি এঁকেছেন যেমন তেমনি গুরুদেবের নানা সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমার অসংখ্য প্রতিকৃতিতে তাঁর ছবির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে রয়েছে। সেই জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষের রূপ তাঁর স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। নাজুক স্বভাবের জন্য চিত্রনিভা সহজে সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন না কিন্তু আশ্চর্য ছিল কবির মন, কী করে যেন সকলের

মনের কথা বুঝতে পারতেন। অতি উৎসাহী চিত্রনিভাকে সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'চিত্রনিভা বলতে না পারলেও সবটা উপলব্ধি করতে পারে।'

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন চিত্রনিভা রবীন্দ্রনাথকে যেমন পেয়েছিলেন তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে তেমনি উপাসনা মন্দিরে ও সমস্ত উৎসবে শুনেছেন তাঁর মুখের অমৃতবাণী। একেকদিন সন্ধ্যার পর কখনো কখনো তিনি আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের পড়ে শোনাতেন তাঁর গল্পগুচ্ছের থেকে গল্পের কোন অংশ বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের যে কী দরদী মন ছিল আর আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কী অসীম স্নেহ ছিল তা স্মৃতিকথার পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কীসে তাদের স্বাস্থ্য ভালো হবে, কী করতে পারলে তারা সুরক্ষিত থাকবে সেই চিন্তাতেই নিরন্তর ব্যপৃত থাকতেন। আশ্রমের রান্নাঘরে এতজন ছাত্রছাত্রীর জন্য ঢেঁকিতে ছাঁটা আতপ চালের ভাত রান্না হতো কুকারে কারণ ভাতের ফেন ফেলে দিলে তার সঙ্গে অনেক পুষ্টিকর জিনিষ বেরিয়ে যায়। সেসময় গুরুদেবের নির্দেশে মেয়েদের জন্য শ্রীসদনে বোতলে বোতলে 'পঞ্চতিতা' আসতো যা প্রতিদিন ভোরবেলায় উপাসনার পর প্রত্যেককেই খেতে হতো। বোধকরি ঐ তিতো ঔষধটি নিয়ম করে প্রতিদিন খাওয়ার জন্যই তখনকার দিনে কারুর তেমন অসুখ বিসুখ হতো না। এমনও হয়েছে যে প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে গুরুদেব কী ছবি আঁকছেন তা দেখতে তার পাশে গিয়ে হাজির হলে তিনি ধমক দিয়ে বলেছেন, 'মেয়েদের একটা বড়ো দোষ ওরা শীতে কাঁপবে তবুও গায়ে একটা গরম চাদর দেবে না।' এইভাবে সেকালের ছাত্রছাত্রীরা গুরুদেবকে পেয়েছিলেন স্নেহময় পিতৃরূপে। কী করলে মেয়েদের সুব্যবস্থায় সুরক্ষিত রাখা যায় এই চিন্তাই ছিল তাঁর প্রধান। বিশ্বকবি হয়েও ছোট বড়ো নির্বিশেষে সকলের প্রতিই ছিল তাঁর একই রকম দরদ। এই প্রসঙ্গে চলে আসে কবির ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনার অনুষঙ্গও। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শমীই ছিল তাঁর প্রাণজুড়ে তাই শমীর অকালপ্রয়াণ কবিকে বেশি শোকান্বিত করে তোলে। তিনি যেন সমগ্র বিশ্বের শিশু ও কিশোরের মধ্যে তাঁর অতি আদরের ধন শমীকে খুঁজে পেতেন। স্ত্রী-পুত্র কন্যার উপর্যুপরি মৃত্যুর আঘাতেই যেন দরদী কবির ব্যথিত প্রাণ সকলের বেদনায় বেশি ব্যাকুল হতো। 'স্মৃতিকথা'-য় চিত্রনিভা ছোটখাটো ঘটনা ও কথাবার্তার ভিতর দিয়ে কবিগুরুর সমগ্র ব্যক্তিত্ব, রসবোধ ও সচেতনতার মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানুষটিকে অনেকটাই বের করে আনতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ একবার যখন পারস্যের রাজার আমন্ত্রণে সেখানে যাচ্ছিলেন সেইসময় চিত্রনিভাকে বারবার বলেছিলেন, 'আমাদের সঙ্গে চলো না? পারস্য বেড়িয়ে আসবে।' কিন্তু সেই সময় চিত্রনিভা সাঁওতাল গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাদের বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের একটা বিরাট ছবি আঁকছিলেন বলে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। এত বড়ো একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে তাঁর আপসোসের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু বিশ্বজোড়া খ্যাতি যাঁর, তাঁকে যদি তখন সেই মহামানব রূপে উপলব্ধি করার বোধ জন্মাতো তবে চিত্রনিভা

কবিগুরুকে এত কাছের মানুষ হিসাবে পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতেন যে সে কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে লিখেছেন :

'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানতো।'

১৯৩১ সালে যখন কলকাতা মহানগরীতে মহাসমারোহে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছরের জন্মজয়ন্তীর উৎসব পালন করা হয় তখন শান্তিনিকেতন থেকে নাচ, গান ও নাটকে অভিনয়ের দল এসে বেশ কিছুদিনের জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন। চিত্রনিভাকেও আনা হয়েছিল নাটকের গহনা তৈরী ও আলপনা দেওয়ার জন্য। সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সমস্ত নাটকগুলির অভিনয়ের মূলেই ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাই নাটকগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠতো। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকটি নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্রনাথকে ভিক্ষুবেশে অথবা তপতী নাটকের রাজা রূপে অভিনয়ের অপরূপ দৃশ্য ও রাজা-রাণীর তেজস্বী ভাষায় কথোপকথন চিত্রনিভার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। সেইবার গুরুদেবের পরিচালনায় 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি যেমন অপূর্ব হয়েছিল তেমনি গুরুদেবের উপস্থিতিতে মহড়া দেওয়া সবকটি নাটকই মঞ্চে প্রাণবন্ত হয়ে দর্শক-হৃদয় জয় করেছিল। তখন নাটকে অভিনয় শেষ হয়ে গেলেই শান্তিনিকেতন থেকে যাঁরা এসেছিলেন সেইসব কুশীলব মেয়েরা যে যার কলকাতায় থাকা আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে চলে যেতেন কিন্তু কলকাতায় বেড়াতে যাওয়ার মতন কোন আত্মীয়ের বাড়ী না থাকায় চিত্রনিভাকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই কাটাতে হতো। অনেকদিন একটানা কলকাতায় থেকে শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠ, উদার আকাশ, নির্মল বাতাস উপভোগ করার জন্য চিত্রনিভাকে ছটফট করতে দেখে কবিগুরু ঠাট্টা করে বলতেন 'আরো দুদিন আমার বাড়ি কষ্ট করে ডাল ভাত খেয়েই যাও না কেন।' কথাগুলি বাৎসল্য স্নেহে এত ঘরোয়াভাবে বলতেন যে চিত্রনিভার মনে হত যেন ঠিক নিজের আত্মীয়ের বাড়িতেই আছেন। বিশ্বকবিকে এভাবেই ১৯৩০ সালে যখন লবন আইন ভাঙবার জন্য সারা দেশে সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছে তখন দেশের কাজের সূত্রে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করতে গিয়ে চিত্রনিভা একান্ত কাছের মানুষ হিসাবে পেয়েছিলেন। কবিগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের তাপে মাথায় ছাতা না নিয়ে দু-তিন মাইল খালি পায়ে মেঠো পথে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের মন জয় করে তাদের লবন আইন ভাঙার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পেরে চিত্রনিভা যেমন আনন্দ পেয়েছিলেন তেমনি গ্রামে যাওয়া-আসার পথে ছবি আঁকার অফুরন্ত খোরাকও যে কম পাননি সেটা তাঁর মস্ত একটা লাভ।

শান্তিনিকেতনে 'গান্ধী পুণ্যাহ' একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে শান্তিনিকেতনের সকল শ্রেণীর কর্মী অর্থাৎ, ঝি, চাকর, মেথর, জলের ভারি এবং রান্না করার লোকজন সবাইকে ছুটি দেওয়া হয় এবং তাদের জায়গায় আশ্রমের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে সমস্ত কাজ

গান গাইতে গাইতে আনন্দের সঙ্গে করতে হতো। এটিও গুরুদেবের শিক্ষার একটি ধারা। তিনি চাইতেন আশ্রমের ছেলেমেয়েরা যেন সমস্ত কাজের ভিতর থেকে আনন্দ পায়। এইভাবে সব কাজে গুরুদেবের প্রেরণা পেয়ে পরম আনন্দে চিত্রনিভা তাঁর শান্তিনিকেতনের দিন-যাপন করেছেন।

জীবনের নানা অনুষঙ্গের মধ্যে শান্তিনিকেতনের প্রতিনিয়ত বয়ে চলা প্রবহমান এক খরস্রোতের মধ্যে কতদিনের কথা হারিয়ে গেছে চিত্রনিভার মন থেকে তবু বিস্মৃতির সাগর থেকে যেটুকু উদ্ধার করতে পেরেছেন তাই দিয়ে তিনি ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে স্মরণ-মালিকা গেঁথেছিলেন তাইই 'স্মৃতিকথা' নামে ২০১৫ সালে রাজ্য চারুকলা পর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯ সালের ৯ই নভেম্বর প্রয়াত চিত্রনিভা ওয়াশ পদ্ধতির ঐশ্বর্য তাঁর ছবিতে মেলে ধরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক্ষুদ্রাকৃতি এই গ্রন্থটি চিত্রকলা চর্চার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পাঠকের শৈল্পিক মননে রেখাপাত করবে।

স্মৃতিকথা ॥ চিত্রনিভা চৌধুরী ॥ রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ প্রথম প্রকাশ : ২০১৫

চিত্র পরিচিতি : ১। স্মৃতিকথা বইটির প্রচ্ছদ; ২। চিত্রনিভা চৌধুরীর আঁকা রামকিঙ্করের স্কেচ; ৩। সাঁওতাল পরিবার; ৪। শিমুল।